Vol. IV, Issue-I, 2024 ISSN:2584-0126

SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

মীমাংসাদর্শনে যজ্ঞীয়হিংসার বৈধতা বিচার

অনীশ দাশ

ভূমিকা

নীতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলঃ মানবের ইষ্টসাধনের নিমিত্ত মানবেতর প্রাণী হত্যা করা কি ন্যায়তঃ সঙ্গত না অসঙ্গতঃ? এহেন প্রশ্নের উদয় হয় মূলতঃ প্রাণরক্ষণের অধিকারবিষয়ক ধারণা থেকে। প্রাণসংরক্ষণের ধারণার মূল বক্তব্য হল - মানবের যেমন প্রাণীরূপে জগতে জীবনরক্ষার মৌলিক অধিকার আছে, তেমনই অন্য মানবেতর প্রাণীদেরও জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠার মৌলিক অধিকার রয়েছে। জীবন বিপন্ন হলে মানব নিজের জীবনরক্ষার প্রয়োজনে অন্য জীব, এমনকি মানুষকেও হত্যা করতে পারে। ন্যায়তঃ এই ধরণের মানবেতর জীবহত্যা অপরাধ নয়। কিন্তু কেবল খাদ্যগ্রহণ, কিংবা নিছক শিকারজাতীয় শখপূরণ করার উদ্দেশ্যে অথবা কোন অবান্তর স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যদি প্রাণীহত্যা হয় তবেই প্রশ্ন ওঠে এই হত্যা নৈতিক কিনা। কারণ, প্রাণ হিসেবে মানবেরও বেঁচে থাকার যতটা অধিকার আছে অন্য প্রাণীরও একইভাবে ততটাই বেঁচে থাকার অধিকার থাকে। প্রাণীর জীবনের অধিকার সম্বন্ধে এমন তত্ত্বকে বলে *সমানমর্যাদা তত্ত্ব*। টম রেগান প্রদত্ত সমান মর্যাদাতত্ত্বের মূল দুটি যুক্তি হল –

প্রথমতঃ -

১। যদি কোন প্রাণ নির্দোষ হয় তবে তাকে হত্যা করা অনুচিত। (আশ্রয়বাক্য)

২। মানবেতর জীব নির্দোষ প্রাণ। (আশ্রয়বাক্য)

৩। সুতরাং, মানবেতর জীব হত্যাও অনুচিত। (সিধান্তবাক্য)

দ্বিতীয়তঃ –

১। যদি কোন জীব প্রাণধারণ করে তবে সেই জীবের প্রাণধারণের অধিকার মানুষের প্রাণধারণের অধিকারের মতনই থাকবে। (আশ্রয়বাক্য)

২। মানবেতর প্রাণীও প্রাণধারণ করে। (আশ্রয়বাক্য)

৩। সুতরাং, মানবেতর জীবের প্রাণধারণের অধিকার মানুষের প্রাণধারণের অধিকারের মতনই হবে। (সিধান্তবাক্য)

সমান মর্যাদাতত্ত্বানুসারে প্রদর্শিত হয় যে প্রাণ হিসেবে মানবের যা মর্যাদা সেই একই মর্যাদা অন্য প্রাণীরও প্রাপ্য। মানুষের প্রাণ হিসেবে অন্য কোন মানবেতর প্রাণ হতে শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে পশুহত্যা সম্বন্ধে অন্য অনেক মতও রয়েছে যেখানে প্রাণ বা চেতনা হিসেবে মানবকে অন্য প্রাণীর তুলনায় কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন – পিটার সিঙ্গারের *সমবিবেচনা তত্ত্বানুযায়ী* মানব ও মানবেতর জীবের মর্যাদা সমান না হলেও প্রাণীর জীবনরক্ষার অধিকার সকলের জন্য ন্যায়তঃ সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ায় সকল জীবের পক্ষেই জীবনরক্ষার অধিকার দাবী করা ন্যায়সঙ্গত।

ভারতীয় দর্শনেও প্রাণীহত্যা বিষয়ে এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় এই যে, শ্রুতি একস্থলে বলেছেন, সকল প্রাণীর প্রতি হিংসাই অকর্তব্য (*মা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি*) এবং অন্যত্র শ্রুতিই যজ্ঞস্থলে পশুহত্যাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন (*অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত*)। ফলতঃ সংশয় হয় বৈদিক মতে যদি পশুহত্যা বিষয়ে স্ববিরোধী বক্তব্য উপস্থাপিত হয় তবে সমগ্র বেদপ্রামাণ্যেই সংশয় উপস্থিত হবে। পুনশ্চ বিবেচ্য এই যে, এখানেও অন্য জীবের প্রাণের অধিকারের তুলনায় মানুষের প্রাণের মূল্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে নাকি বৈদিক বিধিটি বস্তুতঃ প্রাণীহত্যার ক্ষেত্রে জীবের নিবৃত্তিপরতাকেই সূচিত করে? বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে তুলনা ক'রে আমাদের আরও বিচার করতে হবে মীমাংসাসম্মত জীবহত্যাবিষয়ক যুক্তিটি পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার সমান মর্যাদাতত্ত্বের অনুকূল নাকি সমবিবেচনা তত্ত্বের অনুকূল নাকি এটি একটি ভিন্ন কোন মতাদর্শ উপস্থাপন করে? এই প্রসঙ্গে আমরা শাবরভাষ্য, *শ্লোকবার্তিক, মীমাংসান্যায়পরিভাষা, মনুসংহিতার মেধাতিথিভাষ্য* প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনকরতঃ বর্তমান প্রসঙ্গে বিচার করেছি।

বেদে যজ্ঞীয় পশুহত্যার বিধানঃ মীমাংসাসম্মত বিচার

আমরা সকলেই এই বিষয়ে অবগত যে আস্তিক দর্শনের চরম প্রামাণ্য হল শ্রুতি। ফলে ভারতীয় দর্শনে যখনই কোন তত্ত্ব বা সমস্যা আলোচিত হয়েছে, সে আধিবিদ্যক, জ্ঞানতাত্ত্বিক কিংবা নৈতিক যাই হোক না কেন, সকলেরই প্রামাণ্য অনুসন্ধান করতে হলে বৈদিকসিধান্তকে গ্রহণ করতে হবে। স্মৃতিশাস্ত্রসমূহও নানা ধর্মীয় বিধি প্রদান করে। কিন্তু কোন স্মৃতি যদি শ্রুতিসিদ্ধান্তের অবিরোধী কোন শাস্ত্রীয় সিধান্ত উপদেশ করেন তখনই কেবল সেই শ্রুত্যনুসারিণী স্মৃতিসিদ্ধান্ত মান্য। স্মৃতিশাস্ত্রও প্রমাণ তবে তা প্রমাণের উপস্থাপকরূপেই প্রমাণ হয়। বস্তুতঃ স্মৃতির লক্ষণ হল, যে বিষয়টি পূর্বে অনুভব করা হয়েছে তার সম্বন্ধে পুনরায় যে জ্ঞান হয় তাকে বলে স্মৃতি।[1]

বেদ যাঁদের বিদিত তাঁরা বেদবিৎ। বেদবিদ্গণের যে – "ইহা কর্তব্য, ইহা অকর্তব্য" – এই প্রকার যে অনুষ্ঠেয়ার্থক স্মরণ তাও ধর্মে প্রমাণরূপেই গণ্য হয়। কিন্তু দার্শনিকগণ স্মৃতিকে প্রমাণ বলেন না যেহেতু, পূর্বে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা যে বিষয়টি অবগত হওয়া যায় স্মৃতি সেই পূর্বানুভূত বিষয়েরই জ্ঞান উৎপন্ন করে। এর অধিক অন্য কোন বিষয় স্মৃতি উপস্থাপন করতে পারে না। মনু প্রভৃতিরও যে বেদার্থস্মরণ সেও অনুরূপপ্রকার হওয়ায় স্মৃতিকে কোনভাবে স্বতঃপ্রমাণ বলা যায় না। যে সকল স্মৃতিকার বেদার্থস্মরণ করেন, তাঁহাদের যে প্রথম প্রত্যক্ষাদিজ্ঞানজনক শাব্দবোধ কিংবা প্রথম শাব্দজ্ঞান তাহাই প্রমাণ। কিন্তু তাঁহাদের নিজ নিজ স্মরণ প্রমাণ নয়। তথাপি বেদার্থস্মরণ দ্বারা বেদে অপ্রাপ্ত নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠেয়বিধি বিষয়ে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ঐ স্মৃতিবচনগুলি দ্বারা অনুমান করা যায় যে, স্মৃতিবিষয়ক বিধিগুলি বর্তমানে বেদে প্রাপ্ত না হলেও এরা শ্রুতিবোধিত-কর্তব্যতাই নির্দেশ করে। সুতরাং, বেদার্থস্মরণ দ্বারা কোন নতুন বিষয়ের জ্ঞান না হলেও লুপ্ত বা অপ্রাপ্ত বৈদিকপ্রমাণের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, স্মৃতি স্বয়ং প্রমাণ না হলেও বৈদিকপ্রমাণের উপস্থাপক প্রমাণরূপে মান্যতা পায়। এর সঙ্গে সঙ্গে এও জানা যায় যে, সকল বৈদিক ধর্মের মূলেই বেদ স্বয়ং কিংবা পরম্পরায় প্রমাণ হয়।

তবে বৈদিকসিধান্তগ্রহণে যে বিশেষ সমস্যা পরিলক্ষিত হয় সেটি হল - বেদে বহুস্থলেই স্ববিরোধী বচনের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমস্যাকে বচনব্যাঘাতদোষও বলা যেতে পারে। বৈদিকবাক্যের এই সকল দোষ দূর করতে বেদবাক্যার্থবিষয়ক যে বিচার যে শাস্ত্রে হয়েছে তাকেই বলে মীমাংসাশাস্ত্র। বস্তুতঃ "মীমাংসা" শব্দের অর্থই হল পূজিতবিচারবচন তথা পূজিত অর্থাৎ, বৈদিকবাক্যের বিচার। এই প্রসঙ্গে কল্পতরুপরিমলকার বলেছেন, যদিও "পূজিতবচনবিচার" শব্দটি ব্যাকরণস্মৃতিসিদ্ধ নয় কারণ, "মীমাংসা" শব্দের মূলনিষ্ঠ "মান্" ধাতু দ্বারা "মান্ পূজায়াম্" – ইত্যাকার ব্যুৎপত্তিতে পূজামাত্রের বাচিত্ব সূচিত হয়। তবে "মান্" ধাতুর "মান বিচারে" – ইত্যাকার ব্যুৎপত্তিতে চুরাদিগণীয় "মান্" ধাতু দ্বারা কেবল বিচারমাত্রের অর্থও সূচিত হয়। ফলে, অধুনাস্থলে "মান্" ধাতুর উভয়ার্থের অন্যতর অর্থগ্রহণ দ্বারা বিশেষণ–বিশেষ্যের অন্যতরত্বগ্রহণের ন্যায় "মীমাংসা" শব্দের দ্বারা পূজিতবিচারবচনার্থ দ্যোতিত হয়েছে।[2]

ভামতীকার মীমাংসার সরলার্থ করেছেন, পরমপুরুষার্থের হেতুভূত সূক্ষ্মতম অর্থনির্ণয়ই বিচারের পূজিততা সূচিত করে।[3] অভিপ্রায় এই যে, "মানের্জিজ্ঞাসায়াম্" – এই প্রকার ব্যুৎপত্তিতে "মীমাংসা" শব্দ দ্বারা "মান্" ধাতুর অর্থ জিজ্ঞাসা হলেও লক্ষণার দ্বারা "মীমাংসা" শব্দ বিচারকেই সূচিত করে। তবে মীমাংসাশাস্ত্র কোন সাধারণ লৌকিক বাক্যার্থের বিচারে প্রবৃত্ত হয় না। মীমাংসাশাস্ত্রে পরমার্থ সূচিত হয় যে শাস্ত্র দ্বারা তারই সূক্ষ্মতম অর্থ বিচারিত হয়। আস্তিকদর্শনে যে শাস্ত্র

জীবের পরমার্থ সূচিত করে তাহল বেদ। মীমাংসাশাস্ত্র এই বেদেরই বাক্যার্থ বিচার করে। বিভিন্ন ন্যায় বা নিয়ম প্রণয়নের দ্বারা বেদের মধ্যে যে সকল স্ববিরোধিতা রয়েছে মীমাংসা সেই স্ববিরোধিতা দূর ক'রে শাস্ত্রীয় তথা বৈদিক প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আশঙ্কার নাশ করে। বলাই বাহুল্য, মীমাংসান্যায় কেবল শ্রুতিবাক্যেই প্রযুক্ত হয় না, স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারেও তার প্রয়োগ হয়ে থাকে।

যাইহোক, পূর্বেই বলা হয়েছে যে বেদে হিংসা বিষয়ে স্ববিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন - সকল প্রাণীর প্রতি হিংসা করা অনুচিত ব'লেও বেদে পশুযাগ বিহিত কর্ম বলে বিবেচিত হয়েছে। মীমাংসাদর্শন উৎসর্গ ও অপবাদ ন্যায় অধ্যাহারকরতঃ উল্লিখিত আশঙ্কার মীমাংসা ক'রে বলেছেন যে, যজ্ঞস্থল ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে মানবেতর প্রাণীহত্যা নৈতিক অপরাধ। এটি সামান্য বিধি। কিন্তু যজ্ঞস্থল হল বিশেষস্থল। ফলে যজ্ঞস্থলে প্রাণীহত্যা ধর্মতঃ বৈধ। এখন প্রশ্ন হবে উৎসর্গ ও অপবাদ নীতি কাকে বলে? এর উত্তরে বলতে হবে যে উৎসর্গন্যায় বলতে সামান্যবিধিকে এবং অপবাদ বলতে বিশেষ বিধিকে বোঝায়। উভয়ের মধ্যে বিরোধে বিশেষ নিয়মই অর্থাৎ, অপবাদই বলবান হয়।[8] বাস্তবেও এমন নিয়ম আমরা দেখে থাকি। শর্করাজাতীয় খাদ্যগ্রহণ সকলের পক্ষেই উচিতরূপে গণ্য হলেও মধুমেহ রোগের রুগীর পক্ষে এই জাতীয় খাদ্যগ্রহণে নিষিদ্ধতাই বৈধরূপে গণ্য হয়। এখানে সকলের পক্ষে শর্করাজাতীয় খাদ্যগ্রহণ হল সামান্য বিধি বা উৎসর্গ। আর মধুমেহ রোগী হল এই নিয়মের বিরুদ্ধ বিশেষ বা অপবাদস্থল। এখানে এই নিয়ম অনুসারেই যজ্ঞীয় হিংসা বৈধরূপে গণ্য হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনুস্মৃতিতেও বলা হয়েছে, বেদই ধর্মের মূল কারণ। বেদ অলৌকিক বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ হয় ব'লে বেদ দ্বারা কোন কর্মটি বিহিত বা বিগীত হচ্ছে তার উপর নির্ভর ক'রে কোন কর্ম পুণ্য বা পাপবাচক হয়ে থাকে। যজ্ঞীয় কর্মটি বেদ দ্বারা হিংসাত্মক ব'লে পরিগণিত হয় না ব'লে বৈদিক দৃষ্টিতে ঐ কর্মটিকে হিংসাত্মক তথা পাপজনক ব'লে গণ্য করা হয় না। যজ্ঞের অঙ্গভূত হিংসা এই কারণে লৌকিক হিংসার ন্যায় পাপজনক বলে গণ্য হবে না। বেদ প্রতিপাদ্য নয় যে হিংসা সেই হিংসাই বর্জনীয়। বস্তুতঃ বেদে যে নিষেধবাক্যসকল আছে সেই বাক্যসকল উল্লঙ্ঘন করলে তবে সেই ব্যক্তি নিষেধবিধির অন্তর্গত হয় এবং সেই কর্মই পাপজনক হয়ে অন্তিমে নরকগতির কারণ হয়। যে ব্যক্তি আপন রাগ তথা আসক্তিবশতঃ হিংসাকর্মে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তিই বেদবিধিলঙ্ঘনকরতঃ পাপজনক কর্ম করে। কিন্তু বৈদিকবিধি অনুসরণ ক'রে কেউ যদি যজ্ঞীয় হিংসায় ব্রতী হয় সেটি পাপজনক হয় না। বস্তুতঃ যজ্ঞীয় পশুগত্যায় অনেক বিধি থাকে। যেমন যজ্ঞে স্ত্রীপশুহত্যা করা যায় না, যজ্ঞে বধ্য পশুকে নির্দোষ অর্থাৎ, সকল অঙ্গে নিখুঁত হতে হয় প্রভৃতি। এর থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার, যজ্ঞীয় কর্মে পশুহত্যার বিধান থাকলেও যথেচ্ছ পশুহত্যা কিংবা যথেচ্ছ মাংসাহারে নিষিদ্ধতাই সূচিত হয়। যেমন বলির পাঁঠার মাংস খাওয়াটি বৈদিক বা তান্ত্রিক দৃষ্টিতে ততটা অন্যায় নয় যতটা অন্যায় বা পাপজনক হয় বাড়িতে মুরগি রান্না ক'রে

খাওয়া। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রবৃত্তির যথেচ্ছ গতি যাতে নিবৃত্ত হয় সেই উদ্দেশ্যেই পশুযাগের বিধান শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সকল মানুষের মাংসাহারের প্রতি রুচি প্রত্যাহার করা সম্ভব নয় ব'লেই পশুহত্যার বিধি আরোপণ দ্বারা মাংসাহারের প্রতি জীবের *পরিমিত প্রবৃত্তি*স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এই *পরিমিত প্রবৃত্তি*লঙ্ঘন ক'রে মানবের যথেচ্ছ ও স্বেচ্ছাপ্রসূত জীবহত্যায় প্রবৃত্তি পশুযাগের বিধি দ্বারা নিবৃত্ত করা হয়েছে। সুতরাং, পশুযাগ জীবের যথেচ্ছ পশুহত্যার নিবৃত্তিই সূচিত করে। এখানে আরও একটি বিষয় স্মর্তব্য যে বৈদিক বিধিসকল জন্মগত বর্ণাশ্রমীদের উপরই প্রযুক্ত হতে পারে। বর্ণসংকর কিংবা ম্লেচ্ছ, যবন প্রভৃতি জাতিদের উপর বৈদিক বিধিসকল প্রযুক্ত হতে পারে না। তাদের জন্য মনুকথিত দশটি সাধারণ মানবধর্মই প্রযুক্ত হবে।[৫]

কিন্তু প্রশ্ন হয়, নিজ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ, স্বর্গলাভাদি সিদ্ধি কিংবা নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য *পরিমিত জীবহত্যা*কি ধর্মসঙ্গত? এতে কি অবলা জীবের প্রতি হিংসা করা হচ্ছে না? কেউ যুক্তি উপস্থাপন ক'রে বলতে পারেন,

১। যদি কোন নির্দোষ প্রাণ হত্যা করা হয় তবে তা হিংসাত্মক কর্ম হয়। (আশ্রয়বাক্য)

২। যদি কোন হিংসাত্মক কর্ম করা হয় তবে তা পাপজনক হয়। (আশ্রয়বাক্য)

৩। যদি কোন নির্দোষ প্রাণের হত্যা করা হয় তবে তা পাপজনক হবে। (আশ্রয়বাক্য) (১,২ H.S.)

৪। যজ্ঞস্থলেও নির্দোষ প্রাণের হত্যা করা হয়। (আশ্রয়বাক্য)

৫। সুতরাং, যজ্ঞস্থলীয় নির্দোষ প্রাণের হত্যাও পাপজনক হয়। (সিধান্তবাক্য) (৩, ৪ M.P.)

এর উত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রুতি যে হিংসাকে পাপজনক নয় ব'লে বিহিত করেছে সেই বিষয়কে লৌকিক হিংসার ন্যায় গণ্য করা অনুচিত। প্রতিপক্ষের যুক্তি বস্তুতঃ একটি সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। "যজ্ঞীয় হিংসাও হিংসা হওয়ায় তা পাপজনক" - এই প্রকারের সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের কোন গ্রহণযোগ্যতা মীমাংসকের শাস্ত্রদৃষ্টিতে নেই। শাস্ত্রের মর্মার্থ এই যে, হিংসা হিংসাত্বরূপে পাপজনক হয় না। উপরন্তু বেদ দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হওয়ায়ই কোন কর্ম হিংসাত্মকরূপে গণ্য হয়। যেমন – শ্যেনযাগ অথবা যজ্ঞহীন প্রাণহত্যা হিংসারূপে বিচার্য।[৬] বেদ প্রতিপাদিত বিহিত কর্মই ধর্ম উৎপন্ন করে। এখন প্রশ্ন ওঠে যে বেদ প্রতিপাদিত ধর্ম কি? "ধর্ম" বলতে মীমাংসক বুঝিয়েছেন সেই প্রকারের বৈদিক বিধিনির্দিষ্ট কর্মকে যা আমাদের বলবৎ অনিষ্টের বিরোধী ইষ্টসাধনতাই উৎপন্ন করে। স্বর্গ প্রভৃতি অলৌকিক সাধ্য বিষয়ে যাঁরা অভিলাষ রাখেন তাঁরাই কেবল ঐ স্বর্গাদি লাভের নিমিত্ত প্রযোজ্য বিধি অনুসরণ ক'রে পশুযাগ করবেন।

পরিসংখ্যাবিধির বিচার :

আমরা জেনেছি, অলৌকিক বিষয়ে বেদই প্রমাণ। বেদ যে বাক্য দ্বারা কোন কর্ম সম্পাদন করতে উপদেশ করে কিংবা কোন কর্ম করতে নিষেধ করে তাকে বলে বিধি। আরও স্পষ্ট ক'রে বললে বিধি হল সেই বৈদিক বাক্য যা প্রমাণান্তরের দ্বারা অপ্রাপ্ত অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক হয় যা কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করে।[৭] সুতরাং, বিধিবাক্য স্বয়ং প্রয়োজনবান্ হন। যেমন – "অগ্নিহোত্রং জুহূয়াৎ স্বর্গকামঃ" – ইত্যাকার বিধিবাক্য দ্বারাই কেবল জানা যায় যে অগ্নিহোত্র করলে স্বর্গলাভ করা যায়। এভাবে এই বিধিবাক্য দ্বারাই কেবল জানা যায় যে অগ্নিহোত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করলে স্বর্গলাভ করা যায়। এভাবে বোঝা যায় যে এই বিধিটি কোন নিরর্থক বাক্য নয় কারণ, বাক্যটি এক প্রকারের ব্যবহারসিদ্ধি করে। অভিপ্রায় এই যে, অগ্নিহোত্র যাগ করলেই যে স্বর্গ হয় - ইহা প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না, কেবল বিধিবাক্য দ্বারাই জানা যায়। সুতরাং, এভাবে বিধিবাক্যটি সার্থক এবং অর্থবহ প্রয়োজনই সিদ্ধ করে। এখন বিধিবাক্যকে নানা প্রকারে বিভাজিত করা যায়। যেমন – বিধিকে এক বিশেষ প্রকারে তিন ভাগে বিভাজিত করতে পারা যায়। সেই তিনটি প্রকার হলঃ অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি এবং পরিসংখ্যা বিধি। যে বৈদিকবাক্যের অর্থ কোন প্রমাণান্তরের দ্বারা জানা যায় না, কিন্তু কেবল ঐ বৈদিকবাক্যের জ্ঞাপকতা দ্বারাই সিদ্ধ হয় তাকে বলে অপূর্ববিধি।[৮] যেমন যদি প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান প্রভৃতি কোন প্রমাণ দ্বারা ইহা জানা যেতে পারে না যে ক – নামক কাজ থেকে খ – নামক ফল নিঃসৃত হয় কিন্তু কেবল ঐ বৈদিক বাক্য দ্বারাই সিদ্ধ হয় তবে ঐ বৈদিকবাক্যকে বলা হয় অপূর্ববিধি। নিয়মবিধি বলতে এমন বৈদিকবাক্যকে বোঝায় যেখানে কোন কার্যের একাধিক কারক হেতু থাকলেও ঐ বৈদিকবাক্য দ্বারা কোন একটি বিশেষ কারকহেতু মাধ্যমেই ঐ বিশেষ কার্য নিষ্পন্ন হবে ব'লে নিয়মসিদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়। [৯] যেমন – "ব্রীহীনবহন্তি" – ইত্যাকার বিধি দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে বৈতুষ্যনামক কার্য (Husking) নখদলন, অবঘাত প্রভৃতি নানা উপায়ে করা গেলেও যদি যজ্ঞের উপলক্ষ্যে বৈতুষ্য করতে হয় তবে মুষল দ্বারা অবঘাত ক'রেই সম্পাদন করতে হবে। অন্তিমে আসে পরিসংখ্যাবিধি। পরিসংখ্যাবিধি বলতে সেই বৈদিক বাক্যকে বোঝায় যা যুগপৎ দুটি বিধানের প্রাপ্তিতে একটিকে গ্রহণ ক'রে অপরটিকে ত্যাগ করে।[১০] এই বিধির উদাহরণ হল "পঞ্চপঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" বাক্যটি। এই বাক্য দ্বারা বোঝা যায় যে পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীদের অতিরিক্ত কোন প্রাণীকে হত্যা করা উচিৎ নয়। শাস্ত্রে কেবল পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীকেই হত্যা ক'রে আহারের বিধান দেওয়া হয়েছে। এই বিধিটি প্রথমতঃ অপূর্ববিধি নয় কারণ, এই বিধির বিষয় যে পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণী তা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারাই গ্রাহ্য হয়। বস্তুতঃ আসক্তিবশতঃ মানুষ পঞ্চনখরবিশিষ্ট

প্রাণীর মাংস গ্রহণ করতেই পারে। একারণে বিধিটি অত্যন্ত অপ্রাপ্ত নয়। ফলে, বিধিটি কোনভাবেই অপূর্ববিধি হচ্ছে না। এই বিধি নিয়মবিধিও নয় কারণ, সাধনের প্রাপ্তি পাক্ষিক হলেই নিয়মবিধি লাগু হয় অর্থাৎ, ফলের প্রাপ্তিতে যখন একপক্ষ গৃহীত হয় তখনই নিয়মবিধির প্রয়োগ হয়। কিন্তু এখানে লক্ষণীয়, আসক্তিবশতঃ মানুষ পঞ্চনখবিশিষ্ট এবং অপঞ্চনখবিশিষ্ট উভয়প্রকারের প্রাণীই যথেচ্ছ হত্যা করতে পারে। সুতরাং, ক্ষুন্নিবৃত্তিরূপ ফলের প্রতি যুগপৎ পঞ্চনখবিশিষ্ট এবং অপঞ্চনখবিশিষ্ট উভয়প্রকারের প্রাণীমাংসাহাররূপ কারণেরই কারকতা প্রাপ্ত হতে পারে। এই হেতুক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জন্য শল্লক, সজারু, গোসাপ, খরগোস ও কচ্ছপ – ইত্যাকার পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণী ভক্ষণ করবে [১১], তদতিরিক্ত কোন পঞ্চনখবিশিষ্ট বা অপঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণী ভক্ষণ করবে না – এইরূপ ব্যাবৃত্তিবোধের উপপত্তির নিমিত্তই পরিসংখ্যাবিধি প্রযুক্ত হয়েছে। মনে রাখতে হবে, উচ্চ ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের নিমিত্ত ভক্ষ্যাভক্ষ্যজনিত কোন বিধিই প্রযুক্ত হয়নি। শূদ্র, স্ত্রী, বর্ণসঙ্কর ইচ্ছানুরূপ সকল প্রাণীর মাংসই আহার করতে পারে। এও মনে রাখতে হবে কেবল ভোজনের নিমিত্তই শাস্ত্রে সংযত প্রাণীহত্যার বিধান দেওয়া হয়েছে। ফলে আধুনিককালে বিজ্ঞানের স্বার্থে যে প্রাণীহত্যা হয়ে থাকে তা সনাতন সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে কতদূর বৈধ তা চিন্তনীয়।

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে, এখানে কেবল পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীদেরই ভক্ষণের বিধান দেওয়া হয়েছে অথচ পঞ্চনখবিশিষ্ট নয় এমন প্রাণীহত্যার প্রতি যে নিষিদ্ধতা রয়েছে তা তো ঐ বিধি দ্বারা গোচরীভূত হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছে, পরিসংখ্যা বিধি দুপ্রকার, যথা – শ্রৌতী এবং লাক্ষণিকী। আলোচ্য পরিসংখ্যাবিধিটি হল লাক্ষণিকী। তার কারণ, লাক্ষণিকী পরিসংখ্যাবিধিতে ইতরনিবৃত্তিবাচক কোন পদ থাকে না।[১২] লক্ষণীয়, আলোচ্যস্থলেও "পঞ্চপঞ্চনখাভক্ষ্যাঃ" বিধিতে কেবল পঞ্চনখরযুক্ত প্রাণীর মাংসগ্রহণই গ্রাহ্য হয় কিন্তু আক্ষরিকভাবে ঐ বিধি দ্বারা অপঞ্চনখরযুক্ত প্রাণীর মাংসগ্রহণে অবৈধতা সিদ্ধ হয় না। আক্ষরিকভাবে এই বিধি দ্বারা কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা হলে পঞ্চনখযুক্ত প্রাণীর মাংস গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এরূপ আক্ষরিক অর্থ গৃহীত হলে প্রথমতঃ বাক্যটির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে দ্বিতীয়তঃ বাক্যটি যে তাৎপর্যে বক্তা বলতে চেয়েছেন তার অনুপপত্তি হবে। বস্তুতঃ বক্তার তাৎপর্য হল মাংসগ্রহণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কেবল পঞ্চনখবিশিষ্ট শশকাদির মাংসই খাবে, তদ্ভিন্ন অন্য মাংস গ্রহণ করবে না। কিন্তু আক্ষরিক অর্থগ্রহণ করলে এই তাৎপর্য গৃহীত হবে না। একারণে বিধিটি লাক্ষণিকী পরিসংখ্যাবিধির অন্তর্গত।

তবে লাক্ষণিকী পরিসংখ্যা বিধির গ্রহণে তিনটি সমস্যা উত্থাপিত হয়। যথা – শ্রুতহানি, অশ্রুতকল্পনা এবং প্রাপ্তবাধ। শ্রুতহানির অর্থ হল শ্রুতির সাক্ষাৎ অর্থ পরিহার, অশ্রুতকল্পনা বলতে শ্রুতি যে অর্থ প্রতিপাদন করেন নি সেই অর্থকে

কল্পনা করা এবং প্রাপ্তবাধ বলতে আসক্তি অথবা প্রমাণান্তরের দ্বারা লব্ধ অর্থের বাধকে বোঝায়। বর্তমানস্থলে শ্রুতহানির তাৎপর্য হল এই যে, "পঞ্চপঞ্চনখাভক্ষ্যাঃ" বিধির শ্রুতার্থ বা আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করলে এই অর্থই হবে যে পূর্বোল্লেখিত সজারু, শল্লক, খরগোস প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত পাঁচটি পঞ্চনখবিশিষ্টপ্রাণী ভিন্ন অন্য কোন পঞ্চনখরযুক্ত প্রাণীও খাদ্যরূপে গৃহীত হবে না। কিন্তু এমন অর্থ গৃহীত হলে "পঞ্চপঞ্চনখাভক্ষ্যাঃ" বিধির তাৎপর্য উপলব্ধ হবে না। এই কারণে এখানে আক্ষরিক শ্রুতার্থ পরিগৃহীত হবে না, তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। অন্যদিকে এখানে যে অশ্রুতকল্পনা হয়েছে তাহল: শ্রুতিতে অপঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীহত্যা অনুচিত ইহা আক্ষরিকভাবে বলা না হলেও তার অর্থ এই বিধি দ্বারা গৃহীত হয়। অন্যদিকে এখানে প্রাপ্তবাধ হল অপঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীর মাংসাহারে যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় পরিসংখ্যাবিধি দ্বারা তার বাধ।[১৩]

জীবহত্যা কীভাবে সমর্থনযোগ্য?: মীমাংসাসম্মত অভিনব যুক্তি

বৈদিক ধর্মে যজ্ঞীয় পশুহত্যায় যে বৈধতা প্রদত্ত হয়েছে তার বিচারে আমরা দেখলাম, যজ্ঞীয় পশুহত্যায় যে শাস্ত্রীয় হিংসা হয় তা পাপজনক নয়। এই প্রসঙ্গে মীমাংসাশাস্ত্রে যে যুক্তি প্রদান করা হয়েছে তাহল –

১। যদি বেদ কোন কর্মকে হিংসাত্মকরূপে অভিহিত করে তবে সেই কর্ম পাপজনক হবে।

২। বেদ যজ্ঞীয় কর্মে পশুহত্যাকে হিংসাত্মক বলে না।

৩। সুতরাং, যজ্ঞীয় কর্মে পশুহত্যা পাপজনক বলে না। (১,২ M.T.)

কিন্তু তথাপি প্রশ্ন ওঠে, *স্বর্গ প্রভৃতির কামনায় বেদে যে পশুহত্যা প্রশংসিত হচ্ছে নৈতিকভাবে তাকেই বা কেন অঙ্গীকার করতে হবে?* অভিপ্রায় এই যে, প্রথমে বেদ কোন কর্মকে পুণ্যজনক বা পাপজনক ব'লে নির্ণয় করবে। তদনন্তর তার উপর ভিত্তি ক'রে আমাদের সেই কর্মকে পুণ্য বা পাপ ব'লে অঙ্গীকার করতে হবে। বেদ যদি লৌকিক দৃষ্টিতে লব্ধ কোন হিংসাত্মক কর্মকেও পাপজনক ব'লে চিহ্নিত না করে তবে সেই কর্মটি কদাপি হিংসারূপে গ্রহণ করে তাকে বর্জন করা যায় না। যেমন যজ্ঞীয় হিংসাকে পাপজনক হিংসাত্মক কর্মরূপে কখনো গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি, উপরন্তু তার যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়েছে। মনুসংহিতাকার বলেছেন, *স্বয়ং ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্য পশুসকল সৃষ্টি করেছেন আর যজ্ঞই সেই লোকের উন্নতির নিদান। এ কারণে যজ্ঞে পশুবধ কোন বধই নয়।*[১৪] *কিন্তু প্রশ্ন হয়, এমন ধর্মীয় বিচার থেকে কেন কোন কর্মকে নৈতিক বলতে হবে?* পিটার সিঙ্গার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, নৈতিকতার বিচার যেন কখনোই কোন ধর্মীয় মানদণ্ডের উপর আধারিত

না হয় কেননা ধর্ম আমাদের স্বাধীন বিচারধারার প্রতিবন্ধক হ'য়ে উঠে। অথচ কোন কর্মের নৈতিকতা নিরূপণ করতে গেলে সর্বদাই তার মানদণ্ডরূপে বুদ্ধিনিষ্ঠ যৌক্তিক মুক্তচিন্তাকে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় কোন নৈতিক কর্মকে নৈতিক ব'লে গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং, এই যুক্তি অনুসারে কখনোই বেদবোধিতকর্তব্যতাকে নৈতিক কর্তব্যরূপে গ্রহণ করা যাবে না।

এমন মতের উত্তরে মীমাংসকের সপক্ষে দুটি যুক্তি উপস্থাপন করা যেতে পারে। প্রথমতঃ বৈদিক দর্শনে কখনোই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতি জোরপূর্বক বাহ্যতঃ কোন নিয়ম আরোপ ক'রে নিবৃত্ত করে নি। শাস্ত্রে ইহা সিদ্ধ যে বিহিত মাংসাহারে, মদ্যপানে এবং যৌনসঙ্গমে জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রয়েছে।[১৫] এই কারণে সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে কোন বিশেষ নিয়ম প্রণয়ন দ্বারা খণ্ডন করা হয়নি। বস্তুতঃ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে কখনোই সম্পূর্ণরূপে সকল জীবের পক্ষে বর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু যথেচ্ছ মাংসাহারে কিছু নিয়ম প্রণয়ন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ আনয়ন করা যেতে পারে। সেই লক্ষ্যেই মীমাংসাশাস্ত্রে পরিসংখ্যাবিধি প্রণয়ন ক'রে জীবের মাংসাহারপ্রবৃত্তির প্রতি নিবৃত্তি সূচিত হয়েছে। লক্ষণীয়, এই হেতুই পরিসংখ্যাবিধি অঙ্গীকারে লব্ধ প্রাপ্তবাধদোষ দূষণীয়রূপে পরিগৃহীত হয়নি। পরিসংখ্যাবিধির তাৎপর্য এই যে ব্যক্তিচরিত্রে পশুমাংসাহার সর্বাংশে দূরীভূত করা সম্ভব নয় ব'লেই শাস্ত্র নির্দিষ্ট কিছু প্রাণীহত্যায় সনিয়ম বিশেষ বৈধতা দিয়েছেন। ফলতঃ মীমাংসাশাস্ত্রেও যজ্ঞীয় পশুহত্যারূপ পরিসংখ্যা বিধিটি যথেচ্ছ পশুহত্যার প্রতি জীবের নিবৃত্তিসূচক কর্তব্যতাই সূচিত করে।

দ্বিতীয় একটি যুক্তিও মীমাংসকের পক্ষে প্রদান করা যায়। বৈদিকদর্শনে পশুহত্যাসংক্রান্ত বিচারে একথা অনস্বীকার্য যে পশুজীবনের তুলনায় মনুষ্যজীবনের মূল্যকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং, এই দৃষ্টিতে মীমাংসার জীবহত্যাজনিত বিচার পাশ্চাত্যের সমবিবেচনা তত্ত্বের নিকটবর্তী। কিন্তু মানবকে পশুর থেকে এমন অধিক গুরুত্বপ্রদান করার অন্যতম কারণ হল – মানবচরিত্রে উন্নতির সুযোগ আছে যা পশুর চরিত্রে নেই। অর্থাৎ, মানব পশুর চেয়ে উন্নত কারণ, মানব তার প্রবৃত্তিকে নিরোধ ক'রে বা স্বভাবকে বদল ক'রে ক্রমশঃ উন্নত, সুস্থ, সকলের পক্ষে হিতসাধক ব্যক্তিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ফলতঃ এমন কখনোই নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে না, যে ব্যক্তি আজ যথেচ্ছ মাংসাহার করে সেই ব্যক্তি কাল সম্পূর্ণরূপে মাংসাহার ত্যাগ করবে না। আমরা পূর্বে এই প্রবন্ধে দেখেছি, শাস্ত্রে এইরূপে মাংসাহার ত্যাগেরও ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। তবে পুরুষের এই প্রকার পরিবর্তন একদিনে সম্ভব নয়। কিন্তু তাকে নিজ চরিত্র পরিবর্তনের তথা তার বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। এই কারণেই বেদে পরিমিত মাংসগ্রহণের বৈধতা স্বীকৃত হয়েছে। বস্তুতঃ কোন মাংসাহারী ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণরূপে মাংসত্যাগ করতে চান কিন্তু একবারে মাংসত্যাগ করতে না পারেন তবে সে যজ্ঞীয়

মাংসাবশেষরূপে পরিমিত মাংসগ্রহণ করবে এবং তজ্জনিত হিংসাকে হিংসারূপে গ্রহণ করা যাবে না। যেমন একজন অত্যধিক ধূমপায়ী রোগীকে চিকিৎসক প্রতিদিন সীমিত সংখ্যায় ধূমপানের নির্দেশ দিয়ে ক্রমশঃ তাকে ধূমপানের প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করেন, অনুরূপভাবেই যজ্ঞে সীমিত পশুহত্যার অনুমোদন প্রদান ক'রে তাকে সম্পূর্ণভাবে মাংসাহারের অভ্যাস থেকে নিবৃত্ত করাই হল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে পরিমিত মাংসগ্রহণের দ্বারা ঐ ব্যক্তি ভবিষ্যতে সম্পূর্ণভাবে মাংসাহার বর্জন ক'রে পশুহত্যা থেকে নিবৃত্ত হবে এই অভিপ্রায়েই শাস্ত্রে পরিসংখ্যাবিধির মান্যতা দ্বারা যজ্ঞস্থলে পরিমিত প্রাণীহত্যাকে অনুমোদন করা হয়েছে।

১। যে স্মরন্তি তেষামাদ্যমেব তত্র শব্দাদি প্রমাণনাত্মীয়া স্মৃতিঃ।

মাণ্ডলিক, বিশ্বনাথ নারায়ণ। (সম্পা.)। (১৮৮৬)। *মেধাতিথিভাষ্য*। গণপৎ শ্রীকৃষ্ণজী'স প্রেস। পৃ – ৬১১

২। যদ্যপি তস্য পূজিতবিচারবচনত্বং ন ব্যাকরণস্মৃতিসিদ্ধং মান পূজায়ামিতি ধাতোঃ পূজামাত্রবাচিত্বাৎ, মান্ বিচারে ইতি চুরাদি পঠিতস্য ধাতোর্বিচারমাত্রবাচিত্বাৎ তথাপি তয়োরন্যতরস্য গ্রহণে ধাত্বর্থতয়া বিশেষণবিশেষ্যান্যতরলাভোঽস্তীত্যভিপ্রায়েণৈবমুক্তম্। যোশী, কে এল। (সম্পা.)। (১৯৮৭)। *কল্পতরুপরিমল*। প্রথম অধ্যায়। পরিমল পাবলিকেশনস। পৃ - ৫০

৩। পূজিতবিচারবচন মীমাংসাশব্দঃ। পরমপুরুষার্থহেতুভূতসূক্ষ্মতমার্থনির্ণয়ফলতাবিচারস্য পূজিততা। যোশী, কে এল। (সম্পা.)। (১৯৮৭)। *ভামতী*। পরিমল পাবলিকেশনস । পৃ - ৪৮

৪। অপবাদাভাবে উৎসর্গপ্রসিদ্ধেঃ। স্বামী, চিদঘনানন্দ ও ঝা, শ্রীআনন্দ। (সম্পা.)। (১৯৮০)। *শাঙ্করভাষ্য*। দ্বিতীয় অধ্যায় । উদ্বোধন কার্যালয় । পৃ - ৪৪৬

৫। ধৃতিক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহম্। ধীবিদ্যাসত্যমক্রোধোদশকং ধর্মলক্ষণম্। মনুসংহিতা, ৬/৯২

৬। নিষেধ্বপিয়োরাগতঃ প্রবৃত্তোহননে স নিষেধেনিযুজ্যতে| এতদেব নিষেধস্যানুষ্ঠানং যন্নিষিধ্যমানস্যাননুষ্ঠানম্ | অগ্নিষোমীয়াদৌ তু নৈব হিংসা প্রতিষেধোস্তি দ্বেষলক্ষণায়ালৌকিক্যাহিংসায়ানিষেধেন নিষিদ্ধত্বাৎ | শাস্ত্রীয়াতু বিধিলক্ষণা ন নিষেধেন বিষয়ীক্রীয়তে লৌকিক্যাং চরিতার্থত্বান্নিষেধস্য | ন চ সামান্যতোদৃষ্টেন হিংসাত্বাল্লৌকিকহিংসাবৈদ্বদিকাঃ পাপহেতুত্বমাপাদয়িতুং শক্যতে যতো ন হিংসাত্বং পাপহেতুত্বে কারণং অপিতু প্রতিষেধেন

বিষয়ীকারণম্ | ন চাত্র প্রতিষেধোঽস্তীত্যুক্তম্ | মাণ্ডলিক, বিশ্বনাথ নারায়ণ। (সম্পা.)। (১৮৮৬)। *মনুসংহিতা*-র *মেধাতিথিভাষ্য*। গণপৎ শ্রীকৃষ্ণজী'স প্রেস। পৃ – ৯৭

৭। তত্র বিধিঃ প্রয়োজনবদর্থ বিধানেনার্থবান। স চাপ্রাপ্তমর্থ বিধতে। শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর, বাসুদেব, (১৯৭২), (সম্পা.), *মীমাংসাসন্যায়প্রকাশ*, ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, পৃ – ১৬ -১৭

৮। যস্য যদর্থত্বং প্রমাণান্তরেণাপ্রাপ্তং তস্য তদর্থত্বেন যো বিধিঃ সোঽপূর্ববিধিঃ। তদেব, পৃ – ২০২

৯। পক্ষেঽপ্রাপ্তস্য তু যো বিধিঃ স নিয়মবিধিঃ ।তদেব, পৃ – ২০২

১০। উভয়স্য যুগপৎপ্রাপ্তৌ ইতরব্যাবৃত্তিপরো বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ । তদেব, পৃ – ২০৩

১১। পঞ্চপঞ্চনখাভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব। শল্লকঃশ্বাবিধগোধাশশঃ কূর্মশ্চপঞ্চমঃ।। --- রামায়ণ, ৪/১৭/৩৯

১২। ইতরনিবৃত্তিবাচকস্য পদস্যাভাবাৎ।

শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর, বাসুদেব, (১৯৭২), (সম্পা.), *মীমাংসাসন্যায়প্রকাশ*, ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, পৃ – ২০৩ – ২০৪

১৩। শ্রুতস্য পঞ্চনখভক্ষণস্য হানাদশ্রুতাপঞ্চনখভক্ষণনিবৃত্তিকল্পনাৎ প্রাপ্তস্য চ পঞ্চাতিরিক্তপঞ্চনখভক্ষণস্য বাধনাদিতি। তদেব, পৃ – ২০৪

১৪। যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা। যজ্ঞস্য ভূতৈ সর্বস্য তস্মাদ্যজ্ঞে বধোঽবধঃ।। মাণ্ডলিক, বিশ্বনাথ নারায়ণ, (১৮৮৬), (সম্পা.), *মনুসংহিতা,* গণপৎ শ্রীকৃষ্ণজী'স প্রেস, পৃ – ৬১১

১৫। ন মাংসভক্ষণে দোষ ন মদ্যেন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।। মাণ্ডলিক, বিশ্বনাথ নারায়ণ, (১৮৮৬), (সম্পা.), *মনুসংহিতা,* গণপৎ শ্রীকৃষ্ণজী'স প্রেস, পৃ – ৬১১

গ্রন্থপঞ্জী

- মাণ্ডলিক, বিশ্বনাথ নারায়ণ, (সম্পা.), *মনুসংহিতা,* বোম্বেঃ গণপৎ শ্রীকৃষ্ণজী'স প্রেস, ১৮৮৬
- মাণ্ডলিক, বিশ্বনাথ নারায়ণ, (সম্পা.), *মেধাতিথিভাষ্য,* বোম্বেঃ গণপৎ শ্রীকৃষ্ণজী'স প্রেস, ১৮৮৬
- যোশী, কে এল, (সম্পা.), *কল্পতরুপরিমল,* প্রথম অধ্যায় পরিমল পাবলিকেশনস, ১৯৮৭

- যোশী, কে এল, (১৯৮৭), (সম্পা.), *ভামতী*, পরিমল পাবলিকেশনস, ১৯৮৭